



**সংবিধান- ০২**

☑ সংশোধনীসমূহ ও অন্যান্য

**সরকারের শ্রেণিবিভাগ- ০১**

☑ আইন বিভাগ

**Syllabus on Bangladesh Affairs**

⇒ **The Constitution of the People's Republic of Bangladesh:** Constitutional Amendments and others.

⇒ **Organs of the Government :**

**a. Legislature :** Representation, Law-making, Financial and Oversight functions; Rules of Procedure, Gender Issues, Caucuses, Parliament Secretariat.

**BCS প্রশ্নাবলী**

**সংবিধান-০২ ও সরকারের শ্রেণিবিভাগ-০১**

- ⇒ বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের বিধানাবলি বর্ণনা করুন। (৪০তম বিসিএস)
- ⇒ বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মূল বিষয়গুলো বর্ণনা করুন। (৪০তম বিসিএস)
- ⇒ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করুন। (৩৮তম বিসিএস)
- ⇒ সংসদে নারী আসন সংরক্ষিত রাখা কতটা যৌক্তিক? (৩৮তম বিসিএস)
- ⇒ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের ভূমিকা বর্ণনা করুন। (৩৭তম বিসিএস)
- ⇒ বাংলাদেশের সংবিধানের নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন। (৩৬তম বিসিএস)
  - ক. বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ম সংশোধনী।
  - খ. বাংলাদেশের সংবিধানের ১২তম সংশোধনী।
  - গ. বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী।
  - ঘ. বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬তম সংশোধনী।
- ⇒ বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ ধারায় আপনি কী ধরনের সংস্কার প্রস্তাব করবেন? (৩৫তম বিসিএস)
- ⇒ বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পাঁচটি দিক উল্লেখ করুন। (৩৫তম বিসিএস)
- ⇒ সংসদীয় সরকার কিভাবে গঠিত হয়? (৩৫তম বিসিএস)
- ⇒ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ক্ষমতার একটি বিবরণ দিন। (৩৫তম বিসিএস)
- ⇒ বাংলাদেশের আইন পরিষদের গঠন সম্পর্কে লিখুন। (৩৫তম বিসিএস)
- ⇒ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় Rules of Procedure-এর গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখুন। (৩৫তম বিসিএস)
- ⇒ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে নিম্নের যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন : (৩৪তম বিসিএস)
  - ক. সংবিধান রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কিত বিধান কি?
  - খ. সংবিধানের প্রাধান্য বলতে কি বোঝায় তা অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন।

- গ. সংবিধানের রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে নাগরিকদের জন্য কি কি বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে?
- ঘ. চলাফেরার ও সমাবেশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত সংবিধানের বিধানদ্বয় কি কি এবং তা কোন কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?
- ঙ. জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা উল্লেখ করুন।
- ⇒ সংবিধান কি? বাংলাদেশের সংবিধানের মূল ৪টি নীতি কি কি? বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে? মহামান্য রাষ্ট্রপতি কাদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান? মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে কোন কোন সংস্থার প্রধান? (৩৩তম বিসিএস)
- ⇒ মন্ত্রিসভা গঠন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান ব্যাখ্যা করুন। (৩১তম বিসিএস)
- ⇒ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা দিন। (৩১তম বিসিএস)
- ⇒ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ কী কী? সংসদ সদস্যের আসন কেন এবং কখন শূন্য ঘোষণা করা যায়? (৩১তম বিসিএস)
- ⇒ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা দিন। (৩১তম বিসিএস)
- ⇒ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ কী কী? সংসদ সদস্যের আসন কেন এবং কখন শূন্য ঘোষণা করা যায়? (৩১তম বিসিএস)
- ⇒ সংবিধান অনুযায়ী অর্থ বিলে কোন বিষয়াবলী সম্বলিত থাকে? কোন মন্ত্রী/মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এর সার্বিক অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। (২৯তম বিসিএস)
- ⇒ সংবিধান অনুযায়ী অর্থ বিলে কোন বিষয়াবলী সম্বলিত থাকে? কোন মন্ত্রী/মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এর সার্বিক অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। (২৯তম বিসিএস)



### যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ ধারায় আপনি কী ধরনের সংস্কার প্রস্তাব করবেন?
২. জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা উল্লেখ করুন।
৩. মন্ত্রিসভা গঠন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান ব্যাখ্যা করুন।
৪. বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পাঁচটি দিক উল্লেখ করুন।
৫. সংবিধান অনুযায়ী অর্থ বিলে কোন বিষয়াবলী সম্বলিত থাকে? কোন মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এর সার্বিক অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৬. সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী কবে গৃহীত হয়? এ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
৭. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার Rules of Procedure-এর গুরুত্ব তুলে ধরুন।
৮. আইন এবং অধ্যাদেশ বলতে কী বোঝায়? আইন এবং অধ্যাদেশ-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
৯. সংসদীয় সরকারের গঠন প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।
১০. সাংবিধানিক পদ বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশে ৫ টি সাংবিধানিক পদের নাম ও দায়িত্ব সংক্ষেপে লিখুন।



### ১ বিভিন্ন শাসনামলে সাধিত বাংলাদেশের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীসমূহ

সংবিধান একটি দেশের শাসকদের পথ প্রদর্শক। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে একটি সংবিধান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল গণপরিষদে খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। ১৯৭২ সনের ১০ জুন সংবিধানের প্রাথমিক খসড়া অনুমোদিত হয় এবং ১১ অক্টোবর খসড়া চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সনের ১৬ ডিসেম্বর বলবৎ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে। এই ১৭ টি সংশোধনের মধ্যে ৫ম, ৭ম, ১৩তম ও ১৬তম সংশোধনী সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়েছে।

### ১ প্রথম সংশোধনী

১২ জুলাই '৭৩ মনোরঞ্জন ধর বিলটি সংসদে পেশ করেন। ১৫ জুলাই '৭৩ বিলটি সংসদে গৃহীত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৫ই জুলাই এই সংশোধনী আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়। গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত বন্দী পাকিস্তানী সৈনিকদের বিচারের প্রেক্ষাপটে এই সংশোধনী আইনটি প্রণীত হয়-

১. এই সংশোধনের ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ; ২ নং দফার পর নিম্নরূপ নতুন দফা যুক্ত হয়-

“এই সংবিধানে যা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারিতে সৌপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান সংবলিত কোনো আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোনো বিধানের সাথে অসামঞ্জস্য বা তার পরিপন্থী এই কারণে বাতিল বা বে-আইনী বলে গণ্য হবে না। এই সংশোধনী আইন প্রণয়নের পর যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে পাকিস্তানী বন্দী সৈনিকদের বিচারের পথ প্রশস্ত হয়।”

### ২ দ্বিতীয় সংশোধনী

১৮ সেপ্টেম্বর '৭৩ মনোরঞ্জন ধর সংশোধনী বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন এবং ২০ সেপ্টেম্বর '৭৩ বিলটি সংসদে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় সংশোধনী আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১৯৭৩ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর। এটা ছিল ১৯৭৩ সালের ২৪ নং আইন। এই সংশোধনী আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জরুরী বিধানবলী সংবলিত নতুন নবম ভাগের সংযোজন। জরুরী বিধানাবলীতে ঘোষণা করা হয় যে, যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা এর যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। এরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে।

এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা পরবর্তী কোনো ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা হবে, অথবা সংসদে উপস্থাপিত হবে, অথবা ১২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সংসদের প্রস্তাব দ্বারা অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর থাকবে না। জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করার অধিকার স্বল্পকালের জন্য স্থগিত থাকবে। তাছাড়া, নাগরিকদের অবাধ চলাফেরার অধিকার, সমবেত হওয়ার অধিকার, সমিতি গঠনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের অধিকার, ব্যবসা ও কারবার পরিচালনার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও পরিচালনার অধিকার জরুরী অবস্থায় ব্যাহত হবে।

### ৩ তৃতীয় সংশোধনী

তৃতীয় সংশোধনী বিলটিও মনোরঞ্জন ধর ২১ নভেম্বর '৭৪ উত্থাপন করেন এবং ২৩ নভেম্বর '৭৪ এ তা সংসদে গৃহীত হয়। এই সংশোধনী আইনটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১৯৭৪ সালের ২৭ নভেম্বর। এটি ছিল ১৯৭৪ সালের ৭৪ নং আইন। বাংলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ চুক্তি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এই সংশোধনী আইন গৃহীত হয়। মিজোরাম বাংলাদেশ সীমা, ত্রিপুরা সিলেট, ভাগলপুর রেলওয়ে লাইন, শিবপুর গৌরাঙ্গালা সীমা, মুছুরী নদী এলাকা, ফেনী নদী সীমান্ত, হাকার খাল, বৈকারী খাল, হিলি বেরুবাড়ি ও লাঠিটলা ডুমাবাড়ি সীমান্ত এলাকা সম্পর্কে ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে তারিখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যবর্তী ভূ-সীমানা নির্ধারণের পর সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে তারিখ বর্ণনা করেন সেই তারিখ হতে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত অন্তর্ভুক্ত এলাকা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার অংশ হবে এবং বহির্ভূত এলাকা এর অংশ হবে না।

### ৪ চতুর্থ সংশোধনী

২৫ জানুয়ারি মনোরঞ্জন ধর বিলটি সংসদে উপস্থাপন করেন। একই দিনে বিলটি সংসদে পাশ হয়। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রণীত হয়। এর ফলে বাংলাদেশ সংবিধানের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই সংশোধনী আইন অনুমোদিত হয়। এর পক্ষে ছিল ১৯৪ ভোট এবং বিপক্ষে কোনো ভোট ছিল না। রাষ্ট্রপতি এই সংশোধনী আইনকে দ্বিতীয় বিপ্লব নামে অভিহিত করেন।

#### ❖ চতুর্থ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য

০১. মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত সরকারের পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার।
০২. মন্ত্রিপরিষদ এর নীতি ও কার্যাবলির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ হয়।
০৩. সংসদ সদস্য না হয়েও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়।
০৪. রাষ্ট্রপতি নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং সংসদের কাছে কোনোক্রমে দায়ী থাকবেন না। তাঁর ইচ্ছানুসারে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ কাজ করবেন।
০৫. একজন উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি হয়। উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হবেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং তাঁরই পরামর্শমতো। রাষ্ট্রপতি তাঁর খুশিমতো তিনি প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত থাকবেন।
০৬. এই সংশোধনী আইনে বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব কিছুটা হ্রাস পায়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও অপসারণ সার্বিকভাবে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে।
০৭. জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে যে দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত ছিল, এই সংশোধনী আইনে তা বাতিল করা হয়।
০৮. এই আইনে বাংলাদেশে একটি জাতীয় দল গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। জাতীয় দল হলে অন্যান্য দলগুলি বে-আইনি বলে ঘোষিত হয়। এই জাতীয় দলের সংগঠন, এর নামকরণ, নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যবস্থা, সদস্যভুক্তি ইত্যাদি রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সম্পন্ন হত।

#### ❖ পঞ্চম সংশোধনী

(৩৬তম বিসিএস)

পঞ্চম সংশোধনী পাস হয় ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল সামরিক শাসনের অধীনে গৃহীত সকল পদক্ষেপকে বৈধতা দেওয়া হয়। ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ও বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবীরের সম্মুখে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেন। সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে যেসব পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ-

০১. সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সংযোজন করা হয়। প্রথমে অধ্যাদেশের মাধ্যমে এটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পরে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে স্থায়ী রূপ দেয়া হয়।
০২. সংবিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করা হয়।
০৩. সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে সকল কর্মের মূলনীতি হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হয়।
০৪. সমাজতন্ত্র শব্দের ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ক ১০২ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের নীতি সংযোজন করা হয়।
০৫. একদলীয় ‘বাকশাল’ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়।
০৬. সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিধান করা হয়।

#### ❖ ষষ্ঠ সংশোধনী

এই সংশোধনী আইনটি শাহ আজিজুর রহমান ১ জুলাই ১৯৮৪ সংসদে উত্থাপন করেন এবং জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় ১৯৮১ সালের ৮ জুলাই। আর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় ৯ জুলাই। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫১ (৪) উপধারায় বর্ণিত আছে যে রাষ্ট্রপতি অথবা উপ রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যভার কালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন না এবং কোনো সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত কিংবা উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলে কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তার আসন শূন্য হবে। সংশোধনীতে উক্ত ৫১ (৪) উপধারায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে যে, উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলে তিনি যে তারিখে রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে তাঁর পদ শূন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে”।

৬৬ (২ক) উপধারায় বর্ণিত ছিল যে কোনো ব্যক্তি কেবল প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হওয়ার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবে না। এই উপধারা সংশোধন করে প্রতিস্থাপিত হয় যে, কেবল রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হওয়ার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবেন না।”

ষষ্ঠ সংশোধনী আইনে ৫১ ধারায় ৪ উপ-ধারার সাথে আরও দুটি নতুন উপ-ধারা সংযোজিত হয়। ৫ উপধারায় বলা হয়েছে “রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি সদস্য হওয়ার

যোগ্যতা অর্জন করবেন না।” ৬ উপ-ধারায় বলা হয় একজন সংসদ সদস্য যদি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন তবে তাঁকে সংগে সংগে সদস্য পদ ত্যাগ করতে হবে।

### ৯ সপ্তম সংশোধনী

২৬ আগস্ট ২০১০ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন এবং বিচারপতি শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেনের সম্মুখে গঠিত বেঞ্চ এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন। এ রায় উল্লেখ করা হয়- “১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলের সকল কর্মকাণ্ডকে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ শাসন অবৈধ ও সংবিধান পরিপন্থী।”

১৯৮৬ সালের ১০ই নভেম্বর তৃতীয় সংসদের ৬ ঘণ্টা স্থায়ী ১ দিনের অধিবেশনে বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী আইনটি গৃহীত হয়। বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন এ কে এম নুরুল ইসলাম। ১১ নভেম্বর বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়। এই সংশোধনী আইনের লক্ষ্য ছিল, জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, যে সমস্ত বিধি বিধান ও সামরিক আইন আদেশ জারি করেছেন এবং ঐ সব বিধি বিধানের ভিত্তিতে যে সমস্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার বৈধতা দান করা এবং সংবিধানের অন্তর্গত করা। ঐসব কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো কোর্টে মামলা দায়ের করা চলবে না। এক কথায়, সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণ করা ছিল এই সংশোধনীর লক্ষ্য।

### ১০ অষ্টম সংশোধনী

বাংলাদেশের সংবিধানের (অষ্টম সংশোধনী) আইন, ১৯৮৮ চতুর্থ সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলির মধ্যে বাংলাদেশ সংবিধান (অষ্টম সংশোধনী) আইনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৮ সালের ৯ই জুন এই আইনটি প্রণীত হয়। এই আইনের ধারাগুলি নিম্নরূপ :

১. ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা : অষ্টম সংশোধনী আইনের ফলে সংবিধানের ২ ধারার পর ২ (ক) ধারা সংযোজিত হবে।  
২ (ক) ধারায় বলা হয়েছে “প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্ম ও প্রজাতন্ত্রের শান্তি ও সম্ভাবের পরিবেশ চর্চা করা হবে।”
  ২. হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন : এই সংশোধনী আইনে সংবিধানের ১০০ ধারা সংশোধন করে বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়।
  ৩. বিদেশি রাষ্ট্র হতে কোনো উপাধি বা ভূষণ গ্রহণ : এই আইনে সংবিধানের ৩০ ধারা সংশোধন করে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশের কোনো নাগরিক রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত কোনো উপাধি, সম্মানসূচক ডিগ্রী বা ভূষণ গ্রহণ করতে পারবেন না।
  ৪. রাজধানীর বানান ও ভাষার নাম : এই সংশোধনী আইনে সংবিধানের ৩ ধারা পরিবর্তন করে ভাষার ইংরেজি প্রতিশব্দ ঠিক করা হয় Bangla (Bengali-এর পরিবর্তে), এবং ৫ ধারা পরিবর্তন করে রাজধানী ঢাকার ইংরেজি নাম স্থির করা হয় Dhaka (Dacca-এর পরিবর্তে)।
- ১১ মে ১৯৮৮ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আইনটি সংসদে উপস্থাপন করেন সংসদ নেতা জনাব মওদুদ আহমদ। ৭ দিন আলোচনার পর ভোট গৃহীত হয়। এই বিলের পক্ষে ভোট দেন ২৫৪ জন।

### ১১ নবম সংশোধনী

চতুর্থ জাতীয় সংসদে মওদুদ আহমেদ ৬ জুলাই ১৯৮৯ বিলটি উত্থাপন করেন এবং ১৯৮৯ সালের ১০ ই জুলাই সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ সংবিধানের নবম সংশোধনী আইন গৃহীত হয়। ১১ ই জুলাই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়। এই বিল গ্রহণের পক্ষে ২৭২ ভোট এবং এর বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি।

এই সংশোধনীর মূল বক্তব্য নিম্নরূপ :

১. উপ-রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।
২. রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন এক সংগে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।
৩. একাধিক্রমে দুই মেয়াদ তথা ১০ বৎসরের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।
৪. ৫ বৎসর পর পর নিয়মিত রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
৫. রাষ্ট্রপতির পদে শূন্যতা দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে সংসদ অধিবেশনে বসবে।

এই আইনে সংবিধানের ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৭২, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪৮, ১৫২ অনুচ্ছেদ এবং সংবিধানের চতুর্থ তফসিল সংশোধিত হয়েছে।

### ১২ দশম সংশোধনী



১৯৯০ সালের ১০ই জুন জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে সংবিধানের দশম সংশোধনী আইন, ১৯৯০ উত্থাপিত হয় এবং ১২ জুন তা গৃহীত হয়। ২৩ জুন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। সংসদে এই বিলটি গৃহীত হয় ২২৬ ভোটে। এই সংশোধনী আইনের ধারাগুলি নিম্নরূপ-

১. সংসদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ৩০ টি আসন আরও দশ বৎসরের জন্য সংরক্ষিত হয়। সংবিধানে দশ বৎসরের জন্য সংসদে মহিলাদের জন্য ১০ টি আসন নির্দিষ্ট ছিল। ১৯৭৮ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত সংবিধানের দ্বিতীয় ঘোষণা আদেশে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ১৫ টি আসনের পরিবর্তে ৩০ টি আসন নির্ধারিত হয় এবং তা ১০ বৎসরের পরিবর্তে ১৫ বৎসর কাল সুনির্দিষ্ট হয়। এই সময় উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে এই সংশোধনী আইনের প্রয়োজন হয়। দশম সংশোধনী আইনে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা হয় ৩০ টি এবং এই ব্যবস্থা দশ বৎসর চালু ছিল।
২. সংবিধানের ইংরেজি এবং বাংলা ভাষ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি বিধানে যে অসংগতি বিদ্যমান ছিল এই সংশোধনী আইনে তার নিরসন ঘটলো। এই আইনে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের ১৮০ দিনের (ছয় মাস) মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন সম্পন্ন হবে।

#### ▲ একাদশ সংশোধনী

২রা জুলাই, ১৯৯১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপন করেন। ৬ আগস্ট ১৯৯১ এ জাতীয় সংসদে তা গৃহীত হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ পুনরায় প্রধান বিচারপতির পদে ফেরত যেতে পারবেন এবং ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ থেকে অস্থায়ী সরকারের যাবতীয় কার্যকলাপ বৈধ বলে বিবেচিত হবে। ১০ আগস্ট, ৯১ এ বিলটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

#### ▲ দ্বাদশ সংশোধনী

(৩৬তম বিসিএস)

২রা জুলাই, ১৯৯১ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিলটি সংসদে পেশ করেন। ৬ আগস্ট বিলটি সংসদে গৃহীত হয় এবং ১৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি বিলটি অনুমোদন দেন। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাস হওয়ার ফলে বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়।

#### ▲ দ্বাদশ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. **সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের সংবিধান সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর হাতেই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত। মন্ত্রীগণ জাতীয় সংসদের নিকট ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে দায়ী।
২. **এককেন্দ্রিক শাসন :** সংবিধান বাংলাদেশকে একটি এককেন্দ্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সকল ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত।
৩. **মৌলিক অধিকার :** এই সংবিধানে নাগরিকগণকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, সাম্যের অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। অবশ্য সংসদ এই সকল অধিকারের উপর আইনগত বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারবে।
৪. **উপাধিসর্বস্ব রাষ্ট্রপতি :** বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি পর পর ২ বার বা আলাদাভাবে ৫ বছরের জন্য ২ বার নির্বাচিত হতে পারবেন। তিনি উপাধিসর্বস্ব রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে কাজ করবেন।
৫. **আইনসভা :** জাতীয় সংসদ নামে অভিহিত বাংলাদেশের একটি আইনসভা থাকবে। প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের হাতে থাকবে। জাতীয় সংসদ ৩৩০ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ৩০০ জন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। আর একমাত্র মহিলাদের জন্য ৩০ টি আসন সংরক্ষিত থাকবে।
৬. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** বাংলাদেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হবে। মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের হাতে ন্যস্ত। সুপ্রীম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়।
৭. **নির্বাচন কমিশন ও কর্মকমিশন :** এই সংবিধানে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের বিধান করা হয়। সরকারি চাকরিতে লোক নিয়োগের একটি স্বাধীন সরকারি কর্মকমিশনের বিধানও সংবিধানে করা হয়।
৮. **দলীয় শৃঙ্খলা :** বর্তমান সংবিধান সংসদে দলীয় শৃঙ্খলা কঠোরভাবে রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়। এটা সংবিধানের অন্যতম বিশেষত্ব। কোনো সংসদ সদস্য নিজের দল ত্যাগ করলে তাকে সংসদের সদস্যপদ হারাতে হবে।
৯. **ন্যায়পাল :** প্রশাসনিক কার্যাবলী বা তাঁকে যে কোনো মন্ত্রণালয় বা সরকারি কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করার ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে।

১০. সংবিধানের সার্বভৌমত্ব : সংবিধানই প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। এর পরিপন্থী যে কোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।
১১. সার্বজনীন ভোটাধিকার : এই সংবিধান অনুযায়ী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক ১৮ বছর উর্ধ্ব বয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।
১২. জরুরি বিধান : বাংলাদেশের সংবিধানে কতগুলি জরুরী অবস্থাকালীন বিধান আছে। জরুরী অবস্থা চলাকালে কতগুলো বিধান এবং মৌলিক অধিকারের বলবৎকরণ স্থগিত রাখা যেতে পারে।

### ➤ এয়োদশ সংশোধনী

সংবিধানের এয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে ১০ মে, ২০১১ এর রায় ঘোষণা করেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের ফুলবেঞ্চ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের এ রায় তখন থেকে কার্যকর হওয়ার কথা বলা হলেও আগামী দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন এ ব্যবস্থার অধীনেই হতে পারে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত তার রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেছেন অবসরপ্রাপ্ত কোনো প্রধান বিচারপতি, প্রধান বিচারপতি কিংবা আপিল বিভাগের অন্য কোনো বিচারপতিকে জড়ানো যাবে না।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য, সহায়তা প্রদান ও সংবিধানের অধীন অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানের কতিপয় বিধানে অধিকতর সংশোধন কল্পে সংবিধানের এয়োদশ সংশোধনী বিল ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় ২১ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখে এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক তা পাস হয় ২৭ মার্চ এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে ২৮ মার্চ, ১৯৯৬।

### ➤ এয়োদশ সংশোধনীটি নিম্নরূপ :

১. প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অনধিক ১০ সদস্য বিশিষ্ট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে।
২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বগ্রহণের ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।
৩. নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ শেষ হবে।
৪. প্রধান উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করবেন।
৫. সংসদ ভেঙে দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে।
৬. প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের নিয়োগ ও শপথ পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি।
৭. রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টাদের নিয়োগ করতে পারবেন।
৮. তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না।
৯. নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করবেন।

১০. প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ : ক. সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা; খ. সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা; গ. আপীল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা; ঘ. আপীল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা; ঙ. বিশিষ্ট ও যোগ্য কোনো নাগরিক অথবা; চ. যদি উপরে বর্ণিত কোনো ব্যক্তিকে পাওয়া না যায় বা কেউ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে প্রেসিডেন্ট স্থায়ী দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

### ➤ চতুর্দশ সংশোধনী

২০০৪ সালের ১৭ মার্চ জাতীয় সংসদে বহুল আলোচিত সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল ২২৬-১ ভোটে পাস হয়। সংসদে উপস্থিত ২২৭ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে একমাত্র কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম বিল পাশের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

১. প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ : ৪৮ অনুচ্ছেদের স্বার্থে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ সংশোধনী অনুযায়ী কেবল প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকারের কার্যালয় এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমূহে প্রেসিডেন্টের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করতে হবে। প্রধামন্ত্রীর ছবি বা প্রতিকৃতি প্রদর্শন করতে হবে দেশের সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমূহে।
২. ৪৫ নারী আসন : ৬৫ অনুচ্ছেদের ৩ দফা সংশোধন করে পরবর্তী সংসদ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত নারীদের জন্য ৪৫ টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংশোধনী অনুযায়ী দলের আসন সংখ্যার অনুপাতে মহিলা আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। সরকারি দল ছাড়াও বিরোধী দলও আসন সংখ্যা অনুযায়ী মহিলা আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারবে।

৩. বিচারপতি, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও পিএসসি চেয়ারম্যানের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি : ৯৬ (১) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বিচারপতিদের অবসর নেয়ার বয়স ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ করা হয়েছে। ১২৯ (১) অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা করা হয়েছে ৬৫ বছর। আগে ছিল ৬০ বছর। ১৩৯ অনুচ্ছেদের ১ দফায় পরিবর্তন করে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যানের ও অন্যান্য সদস্যদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হয়।
৪. সিইসি'র ক্ষমতা বৃদ্ধি : ১৪৮ (১) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ৩ দিনের মধ্যে স্পিকার এমপিদের শপথ গ্রহণ না করলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) তার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এমপিদের শপথ গ্রহণ করবেন।
৫. অর্থবিল : সংবিধানের ৮২ ধারায় একটি শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। এই ধারায় বর্তমানে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এমন কোনো অর্থবিল বা বিল প্রেসিডেন্টের সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যাবে না। সংশোধনীতে এমন কোনো অর্থবিল বা বিল এর স্থানে 'কোন বিল' লেখা হয়েছে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সংযোজন করে সংবিধানে চতুর্দশ সংশোধনী বিল ২০০৪ পাশ করা হয়। পাশ করা বিলটিতে নারী আসন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনসহ সাতটি সংশোধনী রয়েছে। সংবিধানের সংশোধনীগুলো হচ্ছে ৪৮, ৬৫, ৮২, ৯৬, ১২৯, ১৩৯, ১৪৮ অনুচ্ছেদ এবং সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রস্তাবনা সংযুক্তকরণ।

### ১ পঞ্চদশ সংশোধনী

(৩৬তম বিসিএস)

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর সংবিধান সংশোধনে সুপারিশ করার জন্য ২০১০ সনের ২১ জুলাই ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তাতে মহাজোটের বাইরে কোনো সদস্য ছিলেন না। ওই কমিটির সদস্যরা নিজেরা ২৭ টি বৈঠক এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে পাঁচটি বৈঠক করেন। এ ছাড়া সংবিধান বিশেষজ্ঞ, সুশীলসমাজ, মহাজোটের শরিক কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও পত্রিকার সম্পাদকদের মতামত নেয়। এরপরই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিলসহ ৫১ দফা সংশোধনীর সুপারিশ করে ৮ জুন ২০১১ সংসদে রিপোর্ট পেশ করেন। তবে সুপারিশে বিভিন্ন মহলের মতামত স্থান পায়নি। ৩০ জুন ২০১১ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বহুল আলোচিত পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাস হয়। বিভক্তি ভোটে সংশোধনীর পক্ষে ২৯১ ও বিপক্ষে মাত্র ১ টি ভোট পড়ে। একমাত্র স্বতন্ত্র সদস্য ফজলুল আজিম বিলটির বিপক্ষে ভোট দেন। তবে মহাজোটের ১২ জন অসুস্থতার কারণে যোগ দিতে না পারায় বিলটি পাসের দিন তারা ভোট দিতে পারেননি। মহাজোটের শরীক হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, মঈনউদ্দিন খান বাদল, শাহ জিকরুল আহমেদ ও ফজলে হোসেন বাদশা লিখিত আপত্তি উল্লেখ করে ভোট দেন। তারা বিলের বেশ কয়েকটি দফার উপর সংশোধনীর প্রস্তাব দেন। রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনু সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিলোপের সুপারিশ করেন। এ ছাড়া জাতীয়তা ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংজ্ঞায় কিছুটা পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন।

পঞ্চদশ সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য সংশোধনীগুলো হলো : ১. প্রস্তাবনা সংশোধন; ২. রাষ্ট্রধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মের অপব্যবহার রোধ; ৩. জাতির পিতার স্বীকৃতি ও প্রতিকৃতি; ৪. জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব; ৫. অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধাচরণ; ৬. সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধানাবলী; ৭. '৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি বহাল; ৮. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; ৯. জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ; ১০. উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি; ১১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত; ১২. সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি; ১৩. দালাল আইনের পুনরুজ্জীবন; ১৪. নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি; ১৫. পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন; ১৬. অন্তর্বর্তী সরকার ও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন; ১৭. ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সংযোজন; ১৮. স্বাধীনতার ঘোষণা সংযোজন; ১৯. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজন; ২০. সংবিধান সংশোধনে গণভোট বাতিল; ২১. সপ্তম, একাদশ, দ্বাদশ ও এয়োদশ এ চার সংশোধনী বাতিল ২২. বাকশাল গঠন সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্ত।

### ২ ষোড়শ সংশোধনী

(৩৬তম বিসিএস)

১৮ আগস্ট ২০১৪ মন্ত্রিসভায় সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল অনুমোদিত হওয়ার পর ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল-২০১৪ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক।

বিলটি উত্থাপনের পর তা সর্বসম্মতক্রমে পাস হয়। বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৩২৭ টি; বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি। ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধন বিলে সম্মতি দেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এ্যাডভোকেট। এরপর গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে তা আইনে পরিণত করা হয়।

### ৩ উল্লেখযোগ্য সংশোধনী

সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের দফা (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) ও (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২), (৩) ও (৪) প্রতিস্থাপিত হবে, যথা-



- (২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যান্য দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারিত করা যাবে না।
- (৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোনো বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।
- (৪) কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্থায়ী পদত্যাগ করতে পারবেন।

#### ১১ সপ্তদশ সংশোধনী

২৮ জানুয়ারি ২০১৮ মন্ত্রিসভায় সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) বিল অনুমোদিত হওয়ার পর ১০ এপ্রিল ২০১৮ সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) বিল-২০১৮ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক।

বিলটি উত্থাপনের পর তা সর্বসম্মতক্রমে ৮ জুলাই ২০১৮ জাতীয় সংসদে পাস হয়। বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ২৯৮ টি; বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি। ২৯ জুলাই ২০১৮ সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধন বিলে সম্মতি দেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এ্যাডভোকেট। এরপর গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে তা আইনে পরিণত করা হয়।

সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল- জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন আরও ২৫ বছরের জন্য সংরক্ষণ করা।

#### সংশোধনীরসমূহে জনকল্যাণ ও জাতীয় ঐকমত্যের প্রতিফলন বিষয়ে মতামত

যে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। আর এ লক্ষ্যেই ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়। এ সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, “একটি জাতি হিসেবে বাঙালি ইতিহাসে এ প্রথমবারের মতো তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সংবিধান প্রণয়ন করবে।”

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়। তাতে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত সম্বন্ধে ভীতি ও বিদ্বেষ উভয়ই ক্রিয়াশীল ছিল। তাছাড়া অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখলকারী সামরিক নেতৃত্বের জন্য এক ধরনের বৈধতা অর্জন ও জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সমর্থন বলয় সৃষ্টির মানসিকতাও এ ধরনের পরিবর্তনে পরিলক্ষিত হয়। মূলত বলা যায়, রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির পরিবর্তন মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্ট বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানার শামিল।

তবে যে সংশোধনী সম্পর্কে জনগণের মাঝে প্রথম ব্যাপক সাড়া জাগে সেটা হলো চতুর্থ সংশোধনী। বাংলাদেশের মতো একটা উন্নয়নশীল মডেলের প্রাসঙ্গিকতায় এর বড় একটা প্রয়োজন নেই। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। যেখানে পূর্ববর্তী কেবিনেট ব্যবস্থার বিপরীতে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয়, যার কাজ হবে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়া। মূলত জাতীয় ঐকমত্যের প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে এ সংশোধনী গৃহীত হয়েছিল, যা জনগণ মেনে নেয় নি এবং এর বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দলসমূহ বিশেষ করে বামপন্থি দলগুলো বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, সংবিধান একটি রাষ্ট্র তথা জাতির রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। ১৯৭২ সালের সংবিধান তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নত বিশ্বের কাছে একটি Model হিসেবে পরিগণিত। তবে এর সংশোধিত রূপ সম্পর্কে বিশ্বে বিশেষ জনমত সৃষ্টি হয়। ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১৪ বার সংশোধনীর মাধ্যমে মূলত এ সংবিধানের আদর্শের প্রতি কিছু অবমাননা করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত গৃহীত ১৭ টি সংশোধনীর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ বিষয়ই জনকল্যাণের সাথে বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সংশ্লিষ্ট নয়। তাই ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ফেরত যাওয়াটাই শ্রেয়।

১৯৭২ সনের মূল সংবিধানে ফিরে যাওয়ার বিপক্ষে যাদের অবস্থান তাদের মূল বক্তব্য হলো এতে করে রাষ্ট্র পরিচালনার অতীত ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে। এক্ষেত্রে যে মৌলিক বিষয়গুলো ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ করতে পারে এবং যে বিষয়গুলো জনগণের কল্যাণে বা রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজন সে বিষয়গুলো বিশেষ ব্যবস্থায় সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মূল সংবিধান ফিরে যাওয়া যেতে পারে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, এ পর্যন্ত তাতে ১৭ বার সংশোধনী আনা হয়। সংবিধানের এয়োদশ সংশোধনী আনা হয়েছিল ১৯৯৬ সালের ২৫ মার্চ। এর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে স্থায়ী সাংবিধানিক ভিত্তি দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধান ১৭ বার সংশোধিত হলেও অধিকাংশগুলোতেই জনগণের স্বার্থে কিছু করা হয়নি। শাসকশ্রেণির সুবিধার্থে সংশোধনীগুলো করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন জনস্বার্থ প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

**CLASS**

**WORK**

**আইন বিভাগ**

**আইন বিভাগ (Legislative)**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের পঞ্চম ভাগে আইনসভার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের আইন সভা ‘জাতীয় সংসদ’ নামে অভিহিত এবং প্রজাতন্ত্রের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত। বাংলাদেশের আইন-সভা এক-কক্ষবিশিষ্ট এবং রাজধানী ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদের স্থায়ী আসন রয়েছে। একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে সংসদ গঠিত হয় এবং সদস্যগণ সংসদ-সদস্য হিসেবে অভিহিত হন। ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্স (Warrent of Precedence) বা পদ-মর্যাদাক্রমে সংসদ সদস্যগণ সচিবদের উপরে অবস্থান করেন।

### জাতীয় সংসদ

আইনের শাসন, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, নিয়মিত নির্বাচন, শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গণতন্ত্রের বিকল্প নেই। গণতন্ত্রের চর্চাকে গতিশীল করতে এবং গণতন্ত্রের সুফল লাভ করতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হলো আদর্শ ব্যবস্থা। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আস্থাভাজন সদস্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিরোধী দল হিসাবে সংসদে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। জাতীয় সংসদ হলো সকল আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এখানে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন প্রণয়ন করা হয়, দেশে বিদ্যমান সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

### জাতীয় সংসদের গঠন

একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী ৩০০ জন নির্বাচিত সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত। সংরক্ষিত ৫০ টি মহিলা আসনসহ বর্তমানে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। নির্বাচিত সংসদ সদস্যের আসন সংখ্যার অনুপাতে রাজনৈতিক দল হতে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন।

সংসদের কার্যকাল ৫ বছর অর্থাৎ প্রতি ৫ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে এবং পরিচালিত হবে। তবে সংবিধিবদ্ধ কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করেন এবং তাঁরা সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করেন।

### জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

জাতীয় সংসদ সদস্যের মূল দায়িত্ব হলো, দেশের জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা। এছাড়াও নির্বাহী বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ, বাজেট, পাশ সংবিধান সংশোধনসহ বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজ জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নিম্নোক্ত ১১ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

- |  |   |
|--|---|
| ০১. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ।           | ০২. অর্থ বিল সংক্রান্ত কাজ।                 |
| ০৩. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্রান্ত কাজ। | ০৪. নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ।                 |
| ০৫. বিচার বিভাগীয় কাজ।                  | ০৬. সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ। |
| ০৭. সংসদের স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত কাজ।  | ০৮. কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম সংক্রান্ত কাজ। |
| ০৯. নির্বাহী বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ।     | ১০. সংবিধান সংশোধন।                         |
| ১১. বিবিধ কার্যাবলি।                     |   |

০১. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ : বাংলাদেশ সংবিধানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে “জাতীয় সংসদ নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকবে এবং সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত থাকবে”।

সংসদ আইনের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রতিবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকারিতা সম্পূর্ণ অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হবে। সংসদ কর্তৃক কোনো বিল পাস হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে আইনে পরিণত হবে।

০২. অর্থ বিল সংক্রান্ত কাজ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যাবতীয় অর্থের নিয়ন্ত্রক অভিভাবক হলো জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৮৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে “সংসদের কোনো আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতিত কোনো কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে না”। সরকার কর্তৃক কোনো ঋণগ্রহণ বা গ্যারান্টিদান প্রভৃতি অর্থ বিল সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত।

০৩. বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্রান্ত কাজ : প্রত্যেক অর্থ-বৎসর অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথম তারিখ হতে পরবর্তী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্ষেপে বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হবে।

সংসদ সদস্যদের আলোচনা, প্রস্তাব ও সংশোধনী সাপেক্ষে এই বাজেট জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে পাস হয় এবং কার্যকর হয়।

০৪. নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ : জাতীয় সংসদ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করে থাকে। কোনো সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। সংসদের ৫০ জন মহিলা সদস্য নির্বাচন সংসদে অবস্থানরত বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যার অনুপাতে নির্বাচিত হন। এছাড়া সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন।
০৫. বিচার বিভাগীয় কাজ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিচার সংক্রান্ত কাজ মূলত বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত হলেও জাতীয় সংসদ কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণ, দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে জাতীয় সংসদ, সংসদ সদস্যের ২/৩ অংশ ভোটে রাষ্ট্রপতিকে অভিসংশন (Impeachment) করতে পারেন। আবার জাতীয় সংসদ ন্যায়পালকেও অনুরূপ অভিযোগের কারণে অপসারণ করতে পারেন।
০৬. সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ : সরকারি অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ, সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা তা হতে অর্থ প্রত্যাহার কিংবা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে অর্থ প্রদান বা তা হতে অর্থ প্রত্যাহার এবং সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক অর্থের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয় সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হবে।
০৭. সংসদের স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত কাজ : সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে সদস্য নিয়ে সরকারি হিসাব কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি, সংসদের কার্য প্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করা হয়। এ সকল স্থায়ী কমিটি খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারেন। জনগুরুত্ব সম্পন্ন কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্পর্কে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারেন এসব স্থায়ী কমিটি।
০৮. কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম সংক্রান্ত কাজ : সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা জাতীয় সংসদ পরিচালিত হয়। উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংসদের বৈঠক চলাকালে কোনো সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ষাটের কম হলে কোরাম সংকট দেখা দেয় এবং কমপক্ষে ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন স্থগিত বা মূলতবি থাকে।
০৯. নির্বাহী বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ : বর্তমানে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় জাতীয় সংসদ নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন সদস্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রজাতন্ত্রের যাবতীয় নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং মন্ত্রীসভা একক ও যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকে। সংসদের আস্থা হারাতে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। তবে সংসদে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে মন্ত্রীসভা সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
১০. সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কাজ : সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ সংবিধানের কোনো বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ করতে পারবে। তবে সংশোধনী প্রস্তাব পাশের জন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হতে হবে।
১১. বিবিধ কার্যাবলি : যুদ্ধ ঘোষণা ও জন নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা সুপ্রিমকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালত প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সরকারি কর্মচারীদের বিচারের জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের ক্ষমতা সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, সংসদ সদস্য প্রভৃতি অলাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির সম্মানী, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্ত সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর আইন প্রণয়নের কাজ মহান সংবিধানের উপর ন্যস্ত। সংসদে প্রণীত আইন সবচেয়ে শক্তিশালী এবং এটা সমগ্র দেশের জন্য কার্যকর। জাতীয় সংসদ গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে এটাই বাংলাদেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর আইন প্রণয়নের কাজ মহান সংবিধানের উপর ন্যস্ত। সংসদে প্রণীত আইন সবচেয়ে শক্তিশালী এবং এটা সমগ্র দেশের জন্য কার্যকর। জাতীয় সংসদ গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে এটাই বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা।

### সংসদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৬নং অনুচ্ছেদে সংসদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত রয়েছে।

☞ সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা :

০১. বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে।
০২. বয়স কমপক্ষে পঁচিশ বছর পূর্ণ হতে হবে।

৯৮ সংসদ সদস্য হওয়ার এবং থাকার অযোগ্যতা :

০১. কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হলে।
০২. দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় হতে অব্যহতি লাভ না করলে।
০৩. কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন কিংবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করলে।
০৪. নৈতিক ঞ্জলজনিত কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অনূর্ধ্ব দুই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে এবং মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হলে।

### জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

সংবিধানের ৮০ নং অনুচ্ছেদে আইন প্রণয়ন পদ্ধতির নিম্নরূপ বর্ণনা রয়েছে-

আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল-আকারে উত্থাপিত হবে। আনীত বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে সম্মতির জন্য সেটি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির নিকট কোনো বিল পেশ করার পর পনের দিনের মধ্যে সে তাতে সম্মতিদান করবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতিত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তার কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করে একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তা পুনর্বিবেচনা করবে; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে মোট সংসদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করলে সম্মতির জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে সে বিলটিতে সম্মতিদান করবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তা করিতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে সে বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে। সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করলে বা সে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হলে তা আইনে পরিণত হবে এবং সংসদের আইন হিসেবে অভিহিত হবে।

### অর্থবিল- প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

#### অর্থবিল

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান দ্বারা সদস্য স্বাধীন দেশ পরিচালনা করা হয়। পরবর্তী দীর্ঘ এক বছরের মাথায় একটি সংবিধান তৈরি করা হয়, যা ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে কার্যকর হয়। এই সংবিধান হয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এ সংবিধান ১১ বিভাগে বিভক্ত এবং ১৫৩ অনুচ্ছেদ সম্বলিত। সংবিধানের পঞ্চম ভাগের ২য় পরিচ্ছেদে 'আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি' শিরোনামে ৮১ নং অনুচ্ছেদে অর্থবিল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের ৮১ নং অনুচ্ছেদের দফা (১)-এ বলা হয়েছে 'অর্থবিল' বলতে কেবল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোনো একটি সম্পর্কিত বিধানাবলী-সংবলিত বিল বুঝাইবে :

- ক. কোনো কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ;
  - খ. সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ বা কোনো গ্যারান্টি দান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন সংশোধন;
  - গ. সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ তহবিলে অর্থ প্রদান বা অনুরূপ তহবিল হতে অর্থদান বা নির্দিষ্টকরণ;
  - ঘ. সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ কোনো দায় রদবদল বা বিলোপ;
  - ঙ. সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব বাবদ অর্থপ্রাপ্তি, কিংবা অনুরূপ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, কিংবা সরকারের হিসাব-নিরীক্ষা;
  - চ. উপর্যুক্ত উপ-দফাসমূহে নির্ধারিত যে কোনো বিষয়ের অধীন কোনো আনুষঙ্গিক বিষয়।
- দফা (২)-এ বলা হয়েছে, 'কোনো জরিমানা বা অন্য অর্থদণ্ড আরোপ বা রদবদল, কিংবা লাইসেন্স-ফি বা কোনো কার্যের জন্য ফি বা উসুল আরোপ বা প্রদান কিংবা স্থানীয় উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণের বিধান করা হইয়াছে, কেবল এই কারণে কোনো বিল অর্থবিল বলিয়া গণ্য হইবে না'।

### অর্থবিল প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া



অর্থমন্ত্রী বা অর্থ মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮১ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বলা হয়েছে, ‘রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পেশ করার সময় প্রত্যেক অর্থবিলে স্পিকারের স্বাক্ষরে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট থাকিবে যে, তাহা একটি অর্থবিল এবং অনুরূপ সার্টিফিকেট সকল বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে এবং সেই সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।’

বাংলাদেশ সংবিধানের ৮১ (৩) দফায় অর্থবিল নিরূপনের ক্ষেত্রে স্পিকারের সার্টিফিকেটই চূড়ান্ত বলে গণ্য। সেক্ষেত্রে স্পিকারের সার্টিফিকেট নিয়ে আদালতে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। ৭৮ নং অনুচ্ছেদের (১) দফা বলে যে, ‘সংসদের কার্যধারার বৈধতা নিয়ে আদালতে কোনো প্রশ্ন তোলা যাইবে না।’ এ কারণে অর্থবিল নয়- এমন বিলের ওপর অর্থবিলের রং চড়ালেও আদালত প্রতিকার দিতে পারবে না। অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে তাতে সম্মতি দেবেন এবং না দিলেও মেয়াদ শেষে তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

STUDENT



STUDY

## Rules of Procedure

৯৯ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার Rules of Procedure-এর গুরুত্ব :

(৩৫তম বিসিএস)

### Rules of Procedure বা কার্যপ্রণালি বিধি

একটি দেশ পরিচালনার জন্য যেমন সংবিধানের প্রয়োজন হয়, তেমনি একটি দেশের পার্লামেন্ট পরিচালনার জন্য কার্যপ্রণালি বিধি থাকতে হয়। বাংলাদেশের পার্লামেন্ট হলো জাতীয় সংসদ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫ অনুচ্ছেদের (১) দফার (ক) উপ-দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১ এপ্রিল, ১৯৭৩ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি প্রথম প্রণয়ন করেন। এরপর সর্বশেষ ২০০৬ সালে সংশোধিত হলে মোট ১০ বার এর সংশোধনী হয়। জাতীয় সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বিধির প্রয়োজনীয়তা অসীম।

**Rules of Procedure বা কার্যপ্রণালি বিধির গুরুত্ব :** জাতীয় সংসদ হলো বাংলাদেশের আইন পরিষদ বা পার্লামেন্ট। এখান থেকে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সকল নীতি তৈরি হয়। সংসদ সদস্যগণ হলেন আইনপ্রণেতা। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল জনপ্রতিনিধি এই পরিষদের সদস্য। বর্তমানে জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা হলো ৩৫০ জন। একজন স্পিকারের সভাপতিত্বে সদস্যদের নিয়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাকক্ষে সাংসদদের ভূমিকা ও সংসদীয় আচরণ কিরূপ হবে সে সম্পর্কিত বিধিমালাই হলো সংসদের Rules of Procedure বা কার্যপ্রণালি বিধি, যার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

০১. সংসদ আহ্বান, স্থগিতকরণ কিংবা ভঙের বিধি বর্ণনা করা হয়েছে এতে। পাশাপাশি সদস্যবৃন্দের আসন-ব্যবস্থা, শপথ গ্রহণের নিয়ম-কানুন রয়েছে এতে।
০২. প্রথম বৈঠকে স্পিকারের নির্বাচনের জন্য অগ্রসর হবেন।
০৩. Rules of Procedure-এর অন্যতম বিধি হলো সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পালনীয় বিধি। এতে উল্লেখযোগ্য কিছু নিয়ম হলো সদস্যদের সংসদে প্রবেশ করার সময় বা সংসদ কক্ষ ত্যাগ করার সময় সভাপতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। সভাপতি ও বক্তৃতারত কোনো সদস্যের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলাচল করবেন না। স্পিকার কর্তৃক সংসদে ভাষণ দানকালে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করবেন না। সংসদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোনো বই, সংবাদপত্র বা চিঠিপত্র পাঠ করবেন না প্রভৃতি।
০৪. সংসদের সভাকক্ষে ৬০ জনের কম সদস্যের উপস্থিতি হলে স্পিকার সভা মূলতবি করবেন কিংবা ৫ মিনিট ঘণ্টা বাজানোর পরেও যদি কোরাম পূর্ণ না হয় তাহলে সভা মূলতবি ঘোষণা করবেন।
০৫. মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাব সরকারি কার্যাবলি বলে গণ্য হবে।
০৬. সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাব বেসরকারি কার্যাবলি বলে গণ্য হবে।
০৭. বৃহস্পতিবারে বেসরকারি সদস্যদের কার্যাবলি প্রাধান্য পাবে। অন্যান্য দিনে সরকারি কার্য ব্যতিত অন্য কোনো কার্য সম্পাদন করা হবে না।
০৮. প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম ১ ঘণ্টা প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে। তবে প্রতি বুধবারে অতিরিক্ত ৩০ মিনিট প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে প্রধানমন্ত্রীর জন্য। তবে বাজেটের দিন কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।
০৯. তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন হলো মৌখিক উত্তরের জন্য যে প্রশ্ন এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন হলো লিখিত উত্তরের জন্য যে প্রশ্ন। সম্পূরক প্রশ্ন হলো তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তরদানের পর প্রথমে প্রশ্নকারী ১টি এবং পরে যে কোনো সদস্য উত্তর দিতে পারেন।



১০. অর্থ বিল হলো পরবর্তী বছরের আর্থিক প্রস্তাবসমূহ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যে বিল উত্থাপন করা হয়।

১১. সংসদের অনুমতি ব্যতিত একাধারে ৯০ দিনের বেশি কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

১২. কোনো কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে কোরাম গঠিত হবে প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত ধারাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, Rules of Procedure সংসদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আর যে কোনো দেশ সামনে এগিয়ে চলে সংসদ বা পার্লামেন্টকে কার্যকর করার মধ্য দিয়ে।

**STUDENT**



**STUDY**

**স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার**

### ➤ স্পিকার ও তাঁর নির্বাচন

জাতীয় সংসদের অধিবেশন ও সংসদ কার্যকম পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে জাতীয় সংসদের স্পিকারের নিকট এবং তাকে দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তার জন্য বিধি মোতাবেক একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কোন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর নতুন সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার নির্বাচিত হন। পরবর্তী সংসদের অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার নিজের দায়িত্বে বহাল থাকেন। স্পিকার অসুস্থ বা অনুপস্থিত হলে ডেপুটি স্পিকার তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। পদত্যাগ করতে চাইলে স্পিকারকে রাষ্ট্রপতির কাছে স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত পদত্যাগপত্র পাঠাতে হয়।

### ➤ স্পিকারের কার্যাবলি

স্পিকারকে বলা হয় সংসদের অভিভাবক। স্পিকার সংসদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ও বৈঠকে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। তিনি রাষ্ট্রের সংবিধান ও সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্পিকার সংসদ কক্ষের শৃঙ্খলা ও ভব্যতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

স্পিকার সংসদ নেতার সাথে আলোচনা করে সংসদের কার্যপ্রণালী ঠিক করেন। স্পিকারের নির্দেশ অনুযায়ী সংসদের বৈঠকের সময়-সূচী নির্ধারিত হয়ে থাকে। স্পিকার উপযুক্ত মনে করলে সংসদের বৈঠক মূলতবি করতে পারেন। স্পিকারের অনুমতি স্বাপেক্ষে দিনের কার্যসূচী নির্ধারিত হয় এবং সংসদ নেতার সাথে আলোচনা করে স্পিকার সংসদে সরকারী কার্যের সময় বিন্যাস করে থাকেন।

স্পিকার জাতীয় সংসদের কার্যউপদেষ্টা কমিটির বৈঠক আহবান করেন। তিনি সংসদে ভোট গ্রহণ ও ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করেন। সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব স্পিকারের। সকল বৈধতার প্রশ্নের নিষ্পত্তির দায়িত্ব স্পিকারের, তিনি সংসদের অধিবেশনে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে রুলিং দিতে পারেন। স্পিকার সংসদের মুখপাত্র। তিনি সংসদের প্রতিনিধিত্বও করেন। রাষ্ট্রপতির সাথে স্পিকার যোগাযোগ রক্ষা করেন।

### ➤ স্পিকারের মর্যাদা

সংসদের প্রধান নির্বাহী হিসেবে স্পিকারের মর্যাদা অনেক উপরে। সকল দেশের সংসদেই স্পিকারকে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়। সংসদের অভিভাবক হিসেবে তিনি সরকারী ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যদের নিকট শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের অন্য অনেক দেশের মতো রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে বাংলাদেশে সংবিধান অনুযায়ী স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। সংবিধানে স্পিকারকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী সংসদের কাজ পরিচালনা, শৃঙ্খলা রক্ষা ও অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে স্পিকার আদালতের এখতিয়ারভুক্ত নন। স্পিকারকে দেয় পারিশ্রমিক সংযুক্ত তহবিলে দায়মুক্ত বলে গণ্য।

### ➤ ডেপুটি স্পিকার, তাঁর নির্বাচন ও কার্যাবলি

সংসদ পরিচালনা বিষয়ে স্পিকারকে সহায়তা করার জন্য আইনানুযায়ী সংসদে ডেপুটি স্পিকার রয়েছেন। দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর সংসদের প্রথম বৈঠক স্পিকার নির্বাচনের সাথে সাথে অনুরূপ পদ্ধতিতে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার সংসদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। সংসদ অধিবেশন পরিচালনাকালে ডেপুটি স্পিকার, স্পিকারের অনুরূপ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার লাভ করেন। স্পিকারের পদ শূন্য হলে ডেপুটি স্পিকার, স্পিকারের সকল দায়িত্ব পালন করেন। স্পিকারের মতো ডেপুটি স্পিকারের পদ খুবই মর্যাদাপূর্ণ। নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সংসদ পরিচালনার

মাধ্যমে ডেপুটি স্পিকার সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেন। ডেপুটি স্পিকার তাঁর দায়িত্ব পালনকালে সকল সদস্যের অধিকার, মর্যাদা ও সংযোগ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। স্পিকারের মতো ডেপুটি স্পিকারের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা দায়ের করা যায় না।

#### ▲ স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের নিরপেক্ষতা, দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা

সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। সংসদীয় বিধান অনুযায়ী স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার সংসদে রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে পরিচিত হলেও নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে সংসদ পরিচালনা করবেন বলে আশা করা হয়। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে সংসদ পরিচালনায় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করতে হয় যাতে সংসদে সকল সদস্য তাদের প্রতি সমান আচরণ করা হচ্ছে বলে মনে করতে পারেন। সংসদ পরিচালনায় তাঁরা নিরপেক্ষ না থাকলে সংসদ-সদস্যরা অধিকার বঞ্চিত হন এবং সংসদের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলতে পারেনা।

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারগণ দলমত নির্বিশেষে সকল সদস্যকে সংসদে কথা বলার, বিতর্কে অংশ নেয়ার ও সংসদের অন্যান্য কার্যক্রমে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র এমনকি ভারতেও স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার দলীয় মতাদর্শের উদ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে সংসদ পরিচালনা করেন। উন্নত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবার পর তাঁরা দলীয় পরিচয়ের পরিবর্তে স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের পদকেই বড় করে দেখেন। তাঁরা দলীয় কোন মঞ্চ থেকে কোন বক্তব্য রাখেন না। তাঁরা এমন কোন পদক্ষেপ নেননা যাতে তাঁদের নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠতে পারে।

বাংলাদেশে সংসদ সদস্যদের উপর রাজনৈতিক দলের অতিরিক্ত প্রভাবের কারণে প্রায়ই স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকাররা সমালোচিত হন। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস ও দলীয় প্রভাবের কারণে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারগণ নিরপেক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে প্রায়ই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে অনেক সময়ই সংসদ সদস্যরা স্পিকারের প্রতি অসহিষ্ণু আচরণ করেন। তাঁর কোন সিদ্ধান্ত কারো বিরুদ্ধে গেলে তা কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী যথার্থ কিনা সেভাবে বিচার না করে দলীয় লাভ-ক্ষতির বিবেচনায় প্রতিক্রিয়া জানান। এজন্যে কোন কোন সময় স্পিকার পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

**STUDENT**



**STUDY**

**সংবিধান ও আইন বিভাগ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর**

#### ভোটার হওয়ার যোগ্যতা

সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১২২ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোনো নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারী হবেন, যদি-

- ক. তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;
- খ. তার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;
- গ. কোনো যোগ্য আদালত কর্তৃক তার সম্পর্কে অগ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা বহাল না রেখে থাকে;
- ঘ. তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিকারী বিবেচিত হন; এবং
- ঙ. তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হয়ে থাকেন।

#### সরকারি কর্মকর্তার সাংবিধানিক রক্ষাকবচ

১. সংবিধানের দ্বারা অন্যরূপ বিধান না করা হয়ে থাকলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ী পদে বহাল থাকবেন।
২. প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসাময়িক পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনতি হবে না।

৩. সরকারি পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে তার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনতি করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যেখানে কোনো ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন, সেই আচরণের জন্য তাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনতি করা হয়েছে; অথবা কোনো ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনতি করার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো কারণে-যাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করবেন উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নহে; অথবা রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সুযোগদান সমীচীন নয়। অনুরূপ কোনো ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সেই সম্পর্কে তাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনতি করার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

#### প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি

বাংলাদেশের যে কোনো ভূমির অন্তর্গত সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্ভুক্ত মহাসাগরের অন্তর্গত কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তর্গত সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃতি মালিকবিহীন যে কোনো সম্পত্তি প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধকদাতা ও বিলি-ব্যবস্থা, যে কোনো কারবার বা ব্যবসায়-চালনা এবং যে কোনো চুক্তি প্রণয়ন করা যাবে।

#### চুক্তি ও দলিল

প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলে প্রকাশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি যেকোন নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করবেন, তার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও প্রণালীতে তা সম্পাদিত হবে [১৪৫। (১)]। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোনো চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে না [১৪৫। (২)]। বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোনো চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে [১৪৫ (ক)]।

#### সংবিধানের মাধ্যমে রহিত রাষ্ট্রপতির আদেশসমূহ

রাষ্ট্রপতির নিম্নলিখিত আদেশসমূহ এতদ্বারা রহিত করা হয়েছে :

- ক. আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে প্রণীত);
- খ. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ;
- গ. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ৫)
- ঘ. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ১৫)
- ঙ. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ২২)
- চ. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ২৫)
- ছ. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারি কর্ম সম্পাদন আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ৩৪)
- জ. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারি কর্ম সম্পাদন আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ৫৮)

#### সাংবিধানিক সংস্থা

সংবিধানে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধি মোতাবেক গঠিত প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক সংস্থা বলে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক সংস্থাগুলো হচ্ছে-

১. জাতীয় সংসদ : এ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে সংবিধানের ৫ম ভাগে ৬৫নং অনুচ্ছেদে।
২. সুপ্রীম কোর্ট : এ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদে।
৩. নির্বাচন কমিশন : এ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে সংবিধানে সপ্তম ভাগের ১১৮-১২৬ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।

৪. মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক : এ সংক্রান্তবিধান রয়েছে সংবিধানের অষ্টম ভাগের ১২৭ থেকে ১৩২ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।
৫. সরকারি কর্ম-কমিশন : বাংলাদেশে সংবিধানের নবম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৩৭ থেকে ১৪১ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রয়েছে সরকারি কর্ম-কমিশন সংক্রান্ত বিধানাবলী।
৬. অ্যাটর্নি জেনারেল : সংবিধানের চতুর্থ ভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৬৪ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল সংক্রান্ত বিধান।

#### পদের শপথ

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদে ‘পদের শপথ’ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

১. তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোনো পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণের পূর্বে উক্ত তফসিল অনুযায়ী শপথ বা ঘোষণা (অনুচ্ছেদে ‘শপথ’ বলে অভিহিত) করবেন এবং অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করবেন।
২. এ সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নিকট শপথ গ্রহণ আবশ্যিক হলে অনুরূপ ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করবেন, সেরূপ ব্যক্তির ‘নিকট’ সেরূপ স্থানে শপথ গ্রহণ করা যাবে।
৩. এ সংবিধানের অধীনে যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির পক্ষে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে শপথ গ্রহণ আবশ্যিক, সেক্ষেত্রে শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

#### রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন এর ব্যাপারে বাংলাদেশ সংবিধানের ৫২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

০১. এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করতে হবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন।
০২. এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করতে পারবেন।
০৩. অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকবে।
০৪. অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যান্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে ঘোষণা করে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

#### হেবিয়াস কর্পাস

হেবিয়াস কর্পাস হচ্ছে বাদীকে সশরীরে আদালতে হাজির করা এবং আদালতে বন্দিভের কারণ প্রদর্শনের নির্দেশপত্র। এ কারণে বিবেচনাপূর্বক আদালত তদন্ত করবে যে, বন্দিকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হবে কিনা। হেবিয়াস কর্পাসের জন্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ রিট (writ) করতে পারে। হাইকোর্টকে হেবিয়াস কর্পাসের রিটের ব্যাপারে নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার প্রভৃতি নিশ্চিত করতে হবে।

#### অ্যামিকাস কিউরি

Amicus curiae শব্দটি ল্যাটিন ভাষার। একবচনে Amicus, বহুবচনে Amici। ‘এমিকাস কিউরি’ অর্থ ‘আদালতের বন্ধু’। ১৯ আগস্ট, ২০০৯ সুপ্রিম কোর্টে আদালতকে আইনি সহায়তা দিতে সুপ্রিম কোর্টের ১০ জন সিনিয়র আইনজীবীকে অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ দেয়। তখন থেকেই প্রত্যয়টি আলোচিত হয়ে আসছে। অ্যামিকাস কিউরি বলতে একজন ব্যক্তি অথবা একটি সংগঠনকে বোঝায়, যিনি অথবা যারা মামলার কোনো পক্ষ নন, কিন্তু আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে তথ্য অথবা পরামর্শ দানের মাধ্যমে আদালতের কাজে সহায়তা করেন।

### রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স

সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ‘যদি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এরূপ কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহলে তিনি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিচিনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করতে পারবেন।

### কোর্ট মার্শাল

সেনা আইনে চার প্রকারের কোর্টের বিধান রয়েছে, যথা- সামারি কোর্ট মার্শাল, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট মার্শাল, ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল এবং জেনারেল কোর্ট মার্শাল। অপরাধের গুরুত্ব ও শাস্তি প্রদানের এখতিয়ারের দিকে লক্ষ্য রেখে কোনো কোর্টে সংঘটিত অপরাধের বিচার করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র ফিল্ড জেনারেল এবং জেনারেল কোর্ট মার্শালে বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড থেকে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল নূন্যতম তিন সদস্যের সমন্বয়ে এবং জেনারেল কোর্ট মার্শাল নূন্যতম পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে।

### অধ্যাদেশ

যখন সংসদ অধিবেশনে থাকে অথবা সংসদ যখন বিলুপ্ত, তখন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য রাষ্ট্রপতি যে আইন প্রণয়ন বা জারি করেন তাকে অধ্যাদেশ বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩ (১) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি দু’অবস্থায় অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। প্রথমত, সংসদের অধিবেশন না থাকলে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তিনি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। কোনো অধ্যাদেশ জারির পর যদি তা ইতঃপূর্বে বাতিল না হয় তাহলে সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে সেটি উপস্থাপিত হতে হবে এবং উপস্থাপনের ৩০ দিনের মধ্যে সংসদ অনুমোদন না দিলে অধ্যাদেশটি আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যাবে। অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত অবশ্য বিবেচনায় রাখতে হবে। সেগুলো হলো- এই দফার অধীনে কোনো অধ্যাদেশের-

ক. এমন কোনো বিধান করা হবে না যা সংসদের আইন দ্বারা আইনসঙ্গত করা যায় না।

খ. সংবিধানের কোনো বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হয়ে যায় এমন কোনো অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা যাবে না।

গ. পূর্বে প্রণীত কোনো অধ্যাদেশের যে কোনো বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায় এমন কোনো অধ্যাদেশ করা যাবে না।

সংবিধান কর্তৃক উপর্যুক্ত তিনটি শর্ত সাপেক্ষে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারির ক্ষমতা দেয়ায় যে কোনো অধ্যাদেশের বৈধতার প্রশ্ন তুলে তার সিদ্ধান্তের জন্য আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধা নেই।

(৩৬তম বিসিএস)

### আইন এবং অধ্যাদেশ

**আইন :** আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইন মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন করা হয়। আইন দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্র বা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন প্রণয়ন করা হয়।

**অধ্যাদেশ :** অধ্যাদেশ-ও এক প্রকার আইন, তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে সংবিধান স্বীকৃত নয়। অধ্যাদেশ গ্রহণ ও স্বীকৃতির দ্বারা তা আইনে পরিণত হয়। সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় বা অধিবেশন না থাকাকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রতিকৃত পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত যা জনকল্যাণকর এমন নীতিমালা গ্রহণ-ই অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশ আইন নয়, তবে স্বীকৃতির দ্বারা তা আইনে পরিণত করা যায়। আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে পার্থক্য :

আইন	অধ্যাদেশ
১. আইন সংবিধান স্বীকৃত ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।	১. অধ্যাদেশ জাতীয় সংসদকর্তৃক সরাসরি গৃহীত নয়, এটি



	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরাসরি প্রণয়ন ও জারি করা হয়।
২. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দ্বারা তা পাশ করা হয়।	২. অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে না। কারণ এটি সরাসরি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত।
৩. আইন প্রণয়ন কালে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলমান থাকে।	৩. অধ্যাদেশ প্রণয়নকালে জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত থাকে।
৪. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জরুরি কোনো বিধিবিধানের প্রয়োজন হয় না। তা বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।	৪. অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহীত হয়।
৫. সংবিধানের পঞ্চমভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৮০ নং অনুচ্ছেদে আইন প্রণয়ন পদ্ধতির উল্লেখ আছে।	৫. সংবিধানের পঞ্চমভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৯৩ নং অনুচ্ছেদে অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতার উল্লেখ আছে।
৬. আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।	৬. অধ্যাদেশ প্রণয়নে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

### রাষ্ট্রপতির অপসারণ

সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে সংসদ সদস্যের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অভিযোগের সম্বলিত একটি প্রস্তাব স্পীকারের নিকট প্রদান করতে হয়। স্পীকার সংবিধানে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি অভিশংসনের প্রস্তাবটি সংসদে প্রেরণ করবেন। অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অন্ত্যন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথাযথ বলে ঘোষণা করে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে রাষ্ট্রপতি অভিশংসিত হবেন বা রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

### মন্ত্রিসভা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের ৫৫ নং অনুচ্ছেদে ‘মন্ত্রিসভা’ শিরোনামে (১) থেকে (৬) নং দফায় নিম্নরূপ বলা হয়েছে-

- ক. প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেকোন স্থির করবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে।
- খ. প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা মন্ত্রিসভার উপর প্রযুক্ত হবে।
- গ. মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন।
- ঘ. সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে।
- ঙ. রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হবে, রাষ্ট্রপতি তা বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারণ করবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোনো আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলে তার বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।
- চ. রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলি বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবেন।

### রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৬ নং অনুচ্ছেদে ‘দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা’ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোনো অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোনো কাজ করে থাকলে সংসদ আইনের দ্বারা সে ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করতে পারবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোনো দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোনো কাজকে বৈধ করে নিতে পারবেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদে ‘রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি’-র নীতিতে বলা হয়েছে-

১. এ সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটিয়ে বিধান করা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো কাজ করে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাঁকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে এ দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে না।
২. রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তাঁর গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত থেকে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

### অ্যাটর্নি জেনারেল

#### ➤ অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যাবলী :

অধিকাংশ সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন সরকারের প্রধান আইন উপদেষ্টা। আবার কিছু কিছু বিচারব্যবস্থায় আইন প্রয়োগে জবাবদিহিতার বিষয়ে তিনি নির্বাহীর দায়িত্বে থাকেন অথবা কোনো সাধারণ বিষয়ের আইনগতভাবে তিনি দায়িত্বশীল হিসেবে অথবা প্রসিকিউটর হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় অ্যাটর্নি জেনারেল একটি সাংবিধানিক পদ। সংবিধানের ৬৪ নং অনুচ্ছেদে এই পদের পরিচয় ও কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা নিম্নরূপ :

#### ➤ অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং এর কার্যাবলী :

বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৪ (১, ২, ৩ ও ৪) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

১. সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করবেন।
২. অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।
৪. রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্থায়ী পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

এছাড়া পদাধিকার বলে অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সভাপতি হন। সংবিধানের ১০৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের নিকট রেফারেন্স হিসেবে উপস্থিত হয়ে নিজস্ব মতামত পেশ করতে পারেন। অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস সকল আইনগত বিষয় নিয়ে কাজ করে এবং সরকারের আইনি পরামর্শক হিসেবে আদালতের সামনে সরকারের পক্ষে ওকালতি করে। এ বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল উচ্চ পেশাগত পরিচয় বহন করেন। বর্তমানে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের পদগুলো হলো অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল।

### বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের গঠন

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সর্বোচ্চ বিচার প্রতিষ্ঠান হলো সেসব দেশের সুপ্রিম কোর্ট। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। সুপ্রিম কোর্টই মূলত সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে কাজ করে। নিচে এই আদালতের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

#### ➤ সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা : বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে, তা নিচে আলোচিত হলো :

১. ‘বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট’ নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে তা গঠিত হবে।
২. প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যে সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করবেন, সে সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে।
৩. প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন।
৪. এই সংবিধানের বিধানাবলি-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন।

বিচারক নিয়োগ : বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী-

১. প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করবেন।
২. কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হলে, এবং
  - ক. সুপ্রিম কোর্টে অনূন্য দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট না থেকে থাকলে; অথবা
  - খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অনূন্য দশ বৎসরকাল কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করে থাকলে; অথবা
  - গ. সুপ্রিম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকলে তিনি বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।

৩. এই অনুচ্ছেদে ‘সুপ্রিম কোর্ট’ বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোনো সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসেবে এখতিয়ার প্রয়োগ করেছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হবে।

### সংসদীয় সরকারের গঠন প্রক্রিয়া

পৃথিবীতে বহুল প্রচলিত দু’ধরনের সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তন্মধ্যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা সর্বাধিক জনপ্রিয়। বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর নানা দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর পরই সংসদীয় সরকারের প্রবর্তন হয়েছিল। মাঝপথে কয়েকবার হোচট খেলেও ১৯৯১ সালে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঘটে আজ পর্যন্ত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ব্যবস্থা বা প্রধানমন্ত্রী নির্ভর সরকার ব্যবস্থাও বলা হয়।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন : রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আইন পরিষদের নিকট দায়ী নন। কিন্তু সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নামমাত্র প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী হলেন নির্বাহী ক্ষমতার প্রধান। নিচে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

০১. **প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। আর মন্ত্রিপরিষদ হলো সরকার ব্যবস্থার অংশ। প্রধানমন্ত্রী নির্ধারণ করবেন কে তার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হবেন এবং কার দায়িত্ব কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে। তবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন সংসদের অধিকাংশ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে। প্রধানমন্ত্রীর তার মন্ত্রিপরিষদ যে কোনো বিষয়ের জন্য সংসদ বা পার্লামেন্টের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। সংসদ সদস্যরা হবেন দেশের সকল অঞ্চলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।
০২. **রাষ্ট্রপতি নির্বাচন :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা নামমাত্র। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি তার নামে চললেও কার্যত তিনি ক্ষমতাহীন। কোনো কোনো দেশে রাজা বা রাণী হলেন রাষ্ট্রপতির মতো। সংসদের আইন প্রণেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে থাকেন। সংসদীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত পার্লামেন্টের ভেতরে সদস্যদের ভোটে সংঘটিত হয়।
০৩. **আইন পরিষদ গঠন :** নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইন পরিষদ কার্যকর থাকে। আইন পরিষদের সদস্যরা হলেন দেশের জনপ্রতিনিধি ও আইনপ্রণেতা। দেশের জন্য আইন প্রণয়ন, মন্ত্রিপরিষদের জবাবদিহিতা, যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদে আলোচনা, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা, রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ও অপসারণ প্রভৃতি বিষয়ে আইন পরিষদের ভূমিকা সর্বাধিক।
০৪. **বিরোধী দলের উপস্থিতি :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেয়া হয়। সংসদে বিরোধী দল সরকারি যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারে, সরকারের সমালোচনা করতে পারে, সরকারের ভুল দেখিয়ে দিতে পারে এবং দেশের স্বার্থে তাদের নিজস্ব মতামত দিতে পারে। সংসদীয় পদ্ধতিতে বিরোধী দলকে ছায়া সরকার বলা হয়। সুতরাং সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে সরকারি দলের জবাবদিহিতা বাড়ায়।
০৫. **রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান দুজন ব্যক্তি :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এই ব্যবস্থায় একই ব্যক্তি একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান হতে পারেন না। রাষ্ট্রপ্রধান হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক, যিনি প্রেসিডেন্ট বা সমতুল্য অন্য কোনো পদবিতে ভূষিত হবেন। অন্যদিকে সরকার প্রধান হলেন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইন পরিষদ নেতৃত্ব দিয়ে থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। বর্তমানে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

### বাংলাদেশের আইন পরিষদের গঠন

বাংলাদেশের আইন পরিষদের নাম জাতীয় সংসদ। প্রজাতন্ত্রের সব আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয় সংসদ ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উৎস। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনে সংসদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। পরবর্তীতে দ্বাদশ সংশোধনী আইনে জাতীয় সংসদ আবারো ফিরে পেয়েছে তার পূর্ব গৌরব।

১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ ৩১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। এর মধ্যে ৩০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের ভোটে, বাকি ১৫ জন সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে সংরক্ষিত নারী আসন ৩০ করা হয়। এ ৩০ জন নারী সদস্য সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৩০ টি আসনের বিধান সম্বলিত আইনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় অষ্টম জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ছিল ৩০০।

তবে চতুর্দশ সংশোধনীতে নারীদের জন্য ৪৫ টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে নবম জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৫০ টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংখ্যানুপাতে এ আসন বণ্টিত হয়ে থাকে। এ আসন সংরক্ষণের মেয়াদ ১০ বছর। ফলে জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা বর্তমানে ৩৫০। প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা বা নেত্রী হিসেবে গণ্য হন। জাতীয় সংসদের কার্যকাল ৫ বছর। অবশ্য এ কার্যকালের পূর্বেও রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন।

৯. সাংবিধানিক পদ বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশে ৫ টি সাংবিধানিক পদের নাম ও দায়িত্ব সংক্ষেপে লিখুন।

যেসব পদের নিয়োগ, কার্যকাল, কর্মের পরিধি প্রভৃতি সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে, সেসব পদকে সাংবিধানিক পদ বলে সাংবিধানিক পদ ৯টি: রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিপরিষদ, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদ সদস্যগণ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য সদস্যগণ, কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। নিম্নে ৫ টি পদের দায়িত্ব বর্ণনা করা হলো :

#### ০১. রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্ব সার্ভিসের সর্বাধিকনায়ক। সরকারের যাবতীয় নির্বাহী কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামেই সম্পাদিত হয়। রাষ্ট্রপতি আইনবলে তার নামে প্রণীত আদেশ ও অন্যান্য দলিল সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হওয়ার ধরন নির্ধারণ করেন। রাষ্ট্রপতি সরকারের কার্যক্রম বণ্টন ও কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিধি প্রণয়ন করেন। তার বিবেচনায় অধিকাংশ সংসদ-সদস্যদের সমর্থন লাভে সক্ষম এমন একজন সংসদ-সদস্যকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ প্রদান করেন। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের দায়িত্বও রাষ্ট্রপতির।

#### ০২. স্পিকার / ডেপুটি স্পিকার

স্পিকার সংসদের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ করেন। স্পিকার সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। জাতীয় সংসদের বৈঠকে স্পিকার সভাপতিত্ব করেন। স্পিকারের প্রধান দায়িত্ব সংসদে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং এর মর্যাদা সংরক্ষণ করা। সংসদে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে স্পিকার যে কোনো সদস্যকে বহিস্কার করতে পারেন। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত আছে- রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতি বা তাঁর অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। স্পিকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া সকল কাজে তিনি স্পিকারকে সহায়তা করে থাকেন।

#### ০৩. সংসদ সদস্য

সংসদ সদস্য নিয়মিতভাবে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং জাতীয় সংসদের কার্যবিধি অনুযায়ী স্থায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। একজন সংসদ সদস্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক বিল উত্থাপন করতে পারবেন এবং তিনি অন্য কোনো সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিলের ওপর ভোট দিতে পারবেন। ১৫ দিনের নোটিশ সাপেক্ষে তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন। স্পিকারের অনুমোদনসাপেক্ষে তিনি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণমূলক বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন।

#### ০৪. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণ

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ, আইন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচন পরিচালনা (এর মধ্যে সকল স্থানীয় সরকার পরিষদ; যেমন : পার্বত্য জেলা পরিষদ অন্তর্ভুক্ত) এবং আনুষঙ্গিক কার্যাদির সৃষ্টি সম্পাদন। দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন।

#### ০৫. সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দায়িত্ব হলো প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোনো বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান।

### জাতীয় সংসদ ও রাষ্ট্রপতি

বাংলাদেশে বর্তমানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা প্রধান। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান নামমাত্র প্রধান। শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকে। প্রধানমন্ত্রী সকল কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন। সংসদ সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তবুও বর্তমান ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক। সংসদ অধিবেশন আহ্বান, প্রথম অধিবেশন উদ্বোধন ও সংসদে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শক্রমে তিনি সংসদ ভেঙ্গে দিতেও পারেন। প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি সংসদে বাণী পাঠাতে পারেন।

সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রিসভার অন্ততঃ নয়-দশমাংশ সদস্যকে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিলে রাষ্ট্রপতি ১৫

(পনের) দিনের মধ্যে সম্মতি দেন। তবে তিনি বিলে সম্মতি না দিয়ে ফেরত পাঠাতে পারেন। এই বিল সংসদ পুনরায় পাস করলে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করলে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাতে সম্মতি দিবেন। এতে স্পষ্ট যায় যে, সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিলে রাষ্ট্রপতি ভেটো দিতে পারেন না। গুরুতর অপরাধ, সংবিধান লঙ্ঘন, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে জাতীয় সংসদ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোট অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে। জাতীয় সংসদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক কখনও অভিভাবকের আবার কখনও জবাবদিহিতামূলক। সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক প্রধান। শাসন সংক্রান্ত প্রধান না হলেও এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতির কোন কার্যক্রম সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন উপস্থাপন করা যায় না।

### জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা

জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে প্রধানতঃ সংসদ সদস্যদের নিয়েই (নয়-দশমাংশ) মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সংসদ কক্ষে মন্ত্রিসভার সদস্যদের ফ্রন্ট বেঞ্চে আসনের ব্যবস্থা থাকে। মন্ত্রীরা সরকারি দলের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় কাজ করেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার কাছে সরকার দায়ী থাকে এবং সংসদ সরকারের সকল কাজের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। সংসদীয় ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করলেও বিরোধী দল সর্বদা বিকল্প সরকার হিসেবে কাজ করে।

বর্তমান ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার নয়-দশমাংশ সদস্যকে সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতে নিয়োগ দেয়া যায়। আর এক-দশমাংশ সদস্য সংসদের বাহির হতে নিয়োগ করা যায়। সংসদের বাইরে থেকে নিয়োগকৃত কোন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সংসদের আসন গ্রহণ করতে পারেন; নিজ দপ্তরের ব্যাপারে বক্তব্য দিত পারেন কিন্তু অন্য বক্তব্য রাখতে পারেন না।

মন্ত্রিসভার সদস্যরা একক ও যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী। সংসদের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা অথবা যে কোন মন্ত্রী অবশ্যই পদত্যাগ করতে বাধ্য। সুতরাং সংসদের নিকট দায়ী ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিজ নিজ দপ্তর পরিচালনা করতে হয়। সুতরাং বলা যায় যে, সংসদ মন্ত্রিসভার অভিভাবক। সংসদীয় ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা সংসদের কাছে এবং বাইরে জনগণের কাছে দায়ী থাকে।

### বাংলাদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

“সবার সব নিরাপত্তা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর নিহিত।” উক্তিটি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন। তিনি বলেছেন, সংবাদপত্রের একটি সামাজিক দায় রয়েছে। এ দায়টা হলো কোনো তথ্য জানার অধিকার থেকে পাঠককে বঞ্চিত না করা। আর তখনই চলে আসে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নটি। এ প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না বলা যাবে না। তবে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা বাদ দিলে বাংলাদেশের সংবাদ-মাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে। আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যা সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আঘাত।

এছাড়াও বাংলাদেশে যখন সামরিক শাসন ছিল তখনও সংবাদপত্রের ওপর ছিল নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল। বাংলাদেশের মতো দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণটি রাজনৈতিক। রাজনৈতিক কারণ এ জন্য যে, সরকারের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা, ভুল-ত্রুটি তুলে ধরার দায়িত্ব বিরোধী দলের হলেও সব বিরোধী দলই এ পর্যন্ত সরকারের যথাযথ সমালোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের যথাযথ চিত্র তুলে ধরে, জনগণের চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরে এবং সরকারের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করে সংবাদপত্র যথাযথ বিরোধী দলের ভূমিকায় নিজেদের স্থাপনের চেষ্টা করেছে।

তবে বাংলাদেশে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর কম আঘাত আসেনি। ইতিহাস তার নীরব সাক্ষী। বাংলাদেশ সংবিধানে সংবাদপত্রের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালে ‘প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্ট’ এর মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের হাতে সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়। ওই সময় চারটি বাদে বাকি সব পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। যার ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়ে। অবশেষে ১৯৯১ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের সময়ে এ আইনটি বাতিল করা হয়। আর সামরিক শাসন চলাকালীন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তেমন ছিল না। ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল লাগাতার সংবাদপত্র ধর্মঘটের কারণে। সাংবাদিকরা সেদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্বৈরাচারের পতন হলেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে। এক সপ্তাহ পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ থাকে, অবশেষে ৬ ডিসেম্বর এরশাদের বিদায়ের পর আবার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কাজেই সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ছাড়া একটি দেশের গণতন্ত্র সঠিক এবং অর্থবহ হয়ে ওঠে না। একটি দেশের আয়না হচ্ছে সে



দেশের গণমাধ্যম। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ ধারায় সংবাদ মাধ্যমে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, (১) চিন্তা এবং বিবেকের স্বাধীনতা দান করা হইল। (২) (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

সংবিধানের ২ উপধারাটিকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তবে দেখা যায় যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলেও এখানেও কিছু শর্ত মানতে হবে। সেগুলো হলো- এমন কিছু বিষয় সংবাদ মাধ্যমে আসতে পারবে না; যার জন্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা যায়। এমন কিছু প্রকাশ করা যাবে না; যার জন্য বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় এমন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। অশালীন এবং অনৈতিক কিছু সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না, যার জন্য কেউ অপরাধ করার জন্য প্ররোচিত হতে পারে।

এসব শর্ত মেনে নিয়েই গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়ে থাকে। এসব শর্তের লঙ্ঘন হলে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশ সংবিধানের এ ধারাটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পেছনে গভীর তাৎপর্য বহন করে। কারণ বাংলাদেশে এখন যতটুকু স্বাধীনতা বিদ্যমান, তার প্রায় পুরোটাই সম্ভব হয়েছে সংবিধানে এ ধারাটি যোগ করে। সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে যেমন মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে; তেমনি গোপনীয়তার অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। মত প্রকাশ করতে গিয়ে এমন কিছু করা উচিত নয়; যার জন্য একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। জানার অধিকার এবং গোপনীয়তার অধিকারের মধ্যে সবসময়ে একটি ভারসাম্য রেখে চলতে হয়। তবে এ কথাও সত্য কোনো স্বাধীনতা বা অধিকারই আইনের উর্দে নয়। বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের আরও বিকাশ ঘটুক, দেশ ও জাতি আইনের শাসন ও গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করুক এটাই প্রত্যাশা।